msjCHRONICLE

BRAINWARE UNIVERSITY : DEPARTMENT OF MEDIA SCIENCE & JOURNALISM

Monsoon Edition
July 2025

ধর্ষণ !
P2

ঐতিহ্যবাহী মল্লিকের রথ
P4

IN BRIEF

MSJ CHRONICLE

Editorial co-ordinators for this edition of msjchronicle are Sougata Jana & Prapti Biswas. 4th semester students, Department of Media Science & Journalism

WEATHER

Kolkata, West Bengal
MONDAY , SUNNY
Temperature - 25°C
Precipitation - 80%
Humidity - 88%
Wind - 50-60 km/h

India sends its first astronaut into space

Congratulations
Subhanshu Shukla
After 41 years, India reaches for the stars again -proud moment for the nation as you represent us in the Axiom Space mission. Wishing you a successful journey and safe return.

Group Captain Shubhanshu Shukla

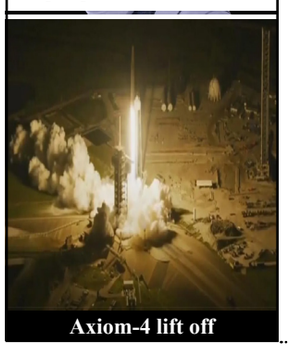

Axiom-4 lift off

বর্ষার ইতিকথা

কুনাল চন্দ্র মন্ডল

বৃষ্টি শুধু নামে না আকাশ থেকে, নামে প্রকৃতির বুক চিরে সবুজের সমারহে, জানালার কাঁচে , রিকশার হুডে, জীর্ণ ছাতার ফাঁকে, ভিজে বইয়ের পাতায়, লাঙলের ফলাতে, টালির ছিদ্রে, ছেঁড়া কাঁথার সুতোর ফাঁকে, ভরাডুবি বন্যায়, প্রেমিকের বিষন্ন মুখবন্ধী খামে ... আর কখনও কখনও—মানুষের অন্তরেও।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতেই আকাশ যেন বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। হঠাৎ করেই অন্ধকারের চাদরে ঢাকা পড়ে যায় শহরের কোলাহল। দিগন্তের কোণে জমতে থাকে সাদা-কালো মেঘের দল, তাদের গুরুগম্ভীর গর্জন জানান দেয় আসন্ন বর্ষণের বার্তা। তারপর এক মুহূর্তে যেন প্রকৃতির বুক ফেটে নামে সে, বর্ষা। রিমঝিম শব্দে জনজীবনের পরিচিত ছন্দে এক নতুন সুর যোগ হয়।

ছোটবেলায় ভিজে জামা গায়ে ইস্কুল থেকে ফিরে আসার অপার আনন্দ কিংবা স্কুলছুট হয়ে বন্ধুদের সাথে ফুটবল খেলা, বাড়ির উঠোনে জমে থাকা জলে কাগজের নৌকা ভাসানোর উচ্ছ্বাস, মাথায় মানকচু পাতা নিয়ে হাঁটু জলে কৈ-মাছ,কাঁকড়ার ধরার হুল্লোড়। অথবা গলির মোড়ের চা-এর দোকানে গরম কাপে উষ্ণ চুমুক কিংবা গ্রামীণ জীবনে ভেজা মাটির বুক চিরে চলা ট্রাক্টরের শব্দে ভাঙ্গা বাঙালির ভাত-ঘুম ,বৃষ্টি ভেজা প্রেমিক-প্রেমিকার জলছবি, সন্ধ্যাতে ব্যাঙের কোলাহলে বা পদ্মাপারে ইলিশের ঝাঁকে — সবকিছুতেই বর্ষা যেন এক অনন্য অনুভূতি। নিঃসঙ্গ দুপুরে জানালার ধারে বসে থাকা, কাঁচের শার্শি বেয়ে গড়িয়ে পড়া বৃষ্টির ফোঁটা গোনা, আর মনের গভীরে এক অজানা সুরের গুঞ্জন—এসবই বর্ষার উপহার। এই স্মৃতিগুলো এতটাই জীবন্ত যে, এক পশলা বৃষ্টি দেখলেই মন কেমন করা এক সুর বেজে ওঠে মন প্রান্তরে।

মহানগরীর বর্ষা এক অন্য রকম গল্প বলে। এখানে বৃষ্টির আগমন মানেই এক ভিন্ন চিত্রনাট্য। মেট্রো স্টেশনের ছাউনি থেকে ছাতা খুলে দৌড় শুরু করা অফিসফেরত মানুষ, ফুটপাতে জমে থাকা নোংরা জলের চোরা গলিতে হোঁচট খাওয়া পথচারী, অথবা স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের রেনকোটের পেছনের প্রিন্টে ফুটে ওঠা হাসিমাখা মুখগুলোর প্রতীকী চিত্র অথবা,কলেজস্ট্রিটের ফুটপাথের বই বিক্রেতা পলিথিনে মুড়ে ফেলা রবীন্দ্রসংগ্রহ, ট্রামের গায়ে জমে ওঠে টুপটাপ জল। কিংবা ভেজা কাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা হলুদ ট্যাক্সি—সবকিছু মিলিয়ে যেন এক জ্যান্ত কোলাজ।

অন্যদিকে;সাহিত্যে, চিত্রকলায়, সঙ্গীতে বর্ষা বরাবরই প্রেম আর বিরহের প্রতীক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অসংখ্য গানে বর্ষা এসেছে প্রেমিকার বেশে, কখনো বা বিচ্ছেদের সুর নিয়ে। "আজি ঝরঝর মুখর বাদল দিনে" বা "বরিষ ধরা মাঝে শান্তি পাবে" — এই অমর সৃষ্টিগুলো বর্ষার সঙ্গে বাঙালির আত্মিক সম্পর্ককে তুলে ধরে। আধুনিক বাংলা গানেও বর্ষার অনবদ্য উপস্থিতি দেখা যায়, যেমন—"এই বরষায় ভিজে দেখি" বা "বৃষ্টি দেখে অনেক কেঁদেছি"। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় ধূসর প্রকৃতির মাঝে বর্ষার বিষণ্ণতা, আর নজরুলের গানে বর্ষার আগমনী সুর—এসবই বর্ষাকে বাংলা সাহিত্যের এক সমৃদ্ধ অংশে পরিণত করেছে। চিত্রশিল্পীরা তুলির টানে ফুটিয়ে তুলেছেন বর্ষার ক্যানভাস, যেখানে কদম আর কেয়া ফুলের সমারোহ, অথবা জলরঙে ভেজা প্রকৃতির স্নিগ্ধ রূপ। কিন্তু বর্তমানে বর্ষা এখন ক্যামেরার সামনে দাঁড়ানো আবেগ, ইনস্টাগ্রামের ফিল্টার-বিষণ্ণতা। সোশ্যাল মিডিয়ার স্লো মোশন ট্রেন্ডিং ভিডিও।

বর্ষা শুধু কাব্যের উপমা নয়, প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য সাঁজঘরের ফ্রেম নয়—বর্ষা কখনও কখনও হয় রক্তচোখ, হয় শ্মশানসন্ন বিবর্ণ দুপুর।

আমাদের জীবনে বর্ষা যেমন আনন্দ বয়ে আনে, তেমনই বয়ে আনে সেই বীভৎস রূপ, যা মুহূর্তে গিলে নেয় জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ। মেঘ দেখে উল্লাসিত হওয়ার আগে আজকাল উপকূলবর্তী মানুষ ভাবে, নদী ফুলবে কিনা, কুঁড়েঘরের চাল সইবে কিনা, শিশুর মুখে আর একদিন ভাত উঠবে কিনা। বৃষ্টির রোমান্টিকতা আজ শহুরে ফিল্টারে আটকে—ইনস্টাগ্রামে "রেনি ডে", চায়ের কাপ, জানালার পাশে মুঠোফোনের মেলোডিতে সীমাবদ্ধ। অথচ, সেই একই বর্ষা বর্তমানে পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতায় কেড়ে নিয়েছে ঘর, কেড়ে নিয়েছে নিশ্চিন্ত ঘুম, এক চিমটে বোনা স্বপ্ন। ১৯৭৮ সালের ভয়াল স্মৃতি যেন ফিরে এসেছে আবার, যখন শিলাবতী নদী ফুলে ফেঁপে গিলে নেয় মানুষের যাপনের প্রতিটি কোণা। ঘাটালে জলের তোড়ে ভেসে গেছেন তুলসী রুইদাস, কিন্তু প্রশাসনের তালিকায় সে শুধুই এক 'নিখোঁজ',কিন্তু কোথায় গেল প্রতিশ্রুতি মূলক ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান? অন্যদিকে বাঁকুড়ার গন্ধেশ্বরী, দামোদর, দ্বারকেশ্বর নদী যেন পাগলের মতো ছুটে আসছে মানুষের আশ্রয় চুরি করতে, গরিবের চালা কুঁড়েঘর এখন কাদা মাখা স্মৃতি মাত্র। হাওড়ার আমতায় বা হুগলির আরামবাগে ভেসে যাচ্ছে বাঁশের সাঁকো, বিচ্ছিন্ন হচ্ছে মানুষ, জমির ফসল একরাশ কাদায় পচে যাচ্ছে। মাঠের লাঙল আর কৃষকের স্বপ্ন আজ এক বুক জলে।

এইসব জায়গায় বর্ষা মানেই রোজগার বন্ধ, সন্তানদের পেট খালি, অসুস্থ মাকে পাড়ার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার রাস্তা ডোবা। ত্রাণ আসে, ছবি তোলা হয়, প্রতিশ্রুতি ঝরে মুখে মুখে—কিন্তু জল কি থামে? বর্ষা আজ একটা সংগ্রামের লড়াই—নদীর সঙ্গে, কপালের সঙ্গে, বুক চেরা স্বপ্নের সঙ্গে, অস্তিত্বের সঙ্গে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন "চিন্তা নেই, আমরা পাশে আছি", কিন্তু কুঁড়েঘরের চালে চুইয়ে পড়া টুপটাপ বৃষ্টির শব্দ বলে—বর্ষা এখন আর ভালোবাসা নয়, বরং একটা বীভৎস রুদ্ধশ্বাস।

প্রিয় ঝড়, অপ্রিয় ঝড়

শিউলি মণ্ডল

ছেলেবেলায় ঝড়ের দিনে আম বাগানে ভাইবোনদের ছুটোছুটি আর অপেক্ষাকৃত কম ছটফটে হওয়ায় আমার সবার শেষে পৌঁছে খালি হাতে ফেরা, তারপর অন্য ভাইবোনদের তামাশা, আমার ভ্যা-ভ্যা করে কাঁদা, কাঁদার জন্য মায়ের হাতে আরও দু ঘা, আবার সেই জন্য আরও কাঁদা। এ ছিল নিয়মিত বিষয়। ছেলেবেলার সেই ঝড়ের প্রতি আমার এখনও ভীষণ অভিমান। যে ঝড়ে আমি চোখের সামনে শতবর্ষের বটগাছ কে উপড়ে পড়তে দেখেছি মানুষের বসত বাড়ির উপর, মন্দির চত্বরে দাঁড়িয়ে দেখা সেই ঝড় আজ ও আমার ভয়ের স্মৃতি।

ধরাবাঁধা স্কুল টিউশনের নিয়মে চলা জীবনে সামান্য স্বাধীনতার অবকাশ ছিল টিউশন থেকে বাড়ির পথটুকু। ঝড়ে বৃষ্টির দিন যে স্বাধীনতার অবকাশ বেড়ে যেত অনেকটা। টিউশনের ঘরটার বাইরে দাঁড়িয়ে যেদিন আমরা তিন বন্ধু ঝড়ের দাপটে ঘাবড়ে না গিয়ে ছুটোছুটি করে ভিজে ক্লান্ত হয়ে আফসোস করছিলাম, আর কয়েক বছরে আমাদের রাস্তাগুলো আলাদা হয়ে যাবে বলে। যখন বৃষ্টির ছিটেকে ঢাল বানিয়েও আমরা কান্না লুকাতে পারিনি, সেদিনের ঝড়টা ছিল আমার কাছে সরলতার বহিঃপ্রকাশ।

যে ঝড়ে আমি একা অন্ধকার কোণে বসে থাকতাম আর ভাবতাম "আমি ভাল নেই কেন?" যতক্ষণ না বৃষ্টি আমায় পুরো ভিজিয়ে দেয়, সেই ঝড়টা আমার বড্ড নিজের।

কলেজ জীবনের প্রথম ঝড়ে যখন আমি গুনগুন করে গেয়েছি, "শ্রাবনের ধারার মতো পড়ুক ঝরে..." সেই ঝড়ে আমি রবীন্দ্রনাথের সাথে আরও একটি মানুষকে বুঝতে শিখেছি।

ঝড় চিরকাল প্রিয়-অপ্রিয় যাই হোক না কেন, আমার বড্ড নিজের। বৃষ্টির থেকেও তাই ঝড়কেই বেশি ভালো লাগতো আজীবন। বুঝতাম না বড়-রা কেন ঝড় চায়না।

যত বয়স বেড়েছে, বাস্তবের সাথে বেড়েছে পরিচিতি। বুঝেছি ঝড়ে কত ঘর উড়ে যায়, কত জীবন উড়ে যায় আর উড়ে যায় কত আশা। 'সেফ জোনে' বসে ঝড় নিয়ে করা 'রোম্যানটিসিস্ম' আমায় দিয়েছে অপরাধবোধ। জীবনের ঝড়ের সাথে পরিচয় হওয়ার পর বৃষ্টিই বেশি আপন হয়ে উঠেছে বোধহয়।

তবু ঝড় আমার একান্ত নিজের হয়ে রয়েই গেছে মনে। কারণ ঝড় আমায় বুঝতে শিখিয়েছে, শক্ত বাড়ি, ঘর, সম্পর্ক আর মানুষ হাজার ঝড়েও ঠিক টিকে যায়।।

The two phases of monsoon

Ahona Roy

Monsoon, not just a season but a period of rejuvenation with a delightful symphony of a refreshing earthy scent and beautiful sights along with nature's own melodious, soothing chorus. The dramatic canvas of sky with gray and white clouds, and the fine strokes of thunder makes the nature artistic. The reviving greenery, the wet soil that fills the atmosphere with a refreshing aroma. It feels so good and relaxing to read a book or listening to the music with the dripping bgm of nature playing in the background. The whole appearance of monsoon feels so soothing and aesthetic just like a visual representation of any romantic poem until you experience rain water dripping inside from the roof of your home, until you get your clothes wet, wet in the water logging city streets.

The romanticism of monsoon dies when you see how people running here and there in search of shelter. The delights of monsoon disappear when floods destroy villages, crops, and lives, and infectious diseases break out.

Monsoon has two different phases: one is the healing phase, a reviving one where everything feels soothing and beautiful; the other one is the destroying one which has witnessed lots of tears, screams, struggles, and fears, which shatters lives and belongings just to destroy the humans' brag of power and creation.

এক অন্য ঢেউয়ের গল্প

সৌগত জানা

সুন্দরবনের উপকূলবর্তী অঞ্চল নামখানা—প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর এক শান্ত জনপদ। চারপাশে নদী, খাল, ম্যানগ্রোভ বন, বালি-মাটির দ্বীপ আর জলের মধ্যে গড়ে ওঠা মানুষের বাসস্থান। বাইরে থেকে দেখতে শান্ত, নিস্তব্ধ, যেন প্রকৃতির আঁচলে ঢাকা পড়ে থাকা এক ছোট্ট কল্পনার গ্রাম। কিন্তু এই সৌন্দর্যের অন্তরালে বাস করে এক চাপা উদ্বেগ, একটি নিরব যুদ্ধ—জীবনের সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে, আর প্রতিটি দিনের অজানা বিপদের সঙ্গে।বর্ষাকাল এলেই এই অঞ্চল যেন প্রকৃতির এক পরীক্ষাগারে পরিণত হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নদীভাঙন, ট্রলার ডুবি, বন্যপ্রাণীর হানা—এই সবকিছু একত্রিত হয়ে গড়ে তোলে এক অনিশ্চিত জীবনের ছায়া। এখানে প্রকৃতি শুধু আশ্রয়দাতা নয়, কখনও কখনও সে হয়ে ওঠে এক শাসক, এক বিচারক—যার রায়ে মানুষকে হারাতে হয় ঘর, প্রিয়জন, কিংবা স্বপ্ন।নামখানার মতো নিচু জায়গায় বর্ষা মানেই শ্বাসরুদ্ধ উদ্বেগ। খালের জল ফুলে ওঠে মুহূর্তেই। চুনকুড়ি, খোনাবাড়ি, সীতার খাল—এইসব প্রাকৃতিক জলধারা, যা বছরের অনেকটা সময় শান্ত থাকে, বর্ষা এলেই তা হয়ে ওঠে অসংযত। হঠাৎ নদীতে টানা তিনদিনের বৃষ্টিতে জল বেড়ে যায়, দুকূল উপচে পড়ে। বাঁধ ভেঙে যায়, জমি জলে ডুবে যায়। বাঁশের পোল, যা এক গ্রামের সঙ্গে আরেক গ্রামকে জুড়ে রাখে, তা ভেঙে পড়ে জলের তোড়ে। এই সমস্ত অবস্থায় বর্ষার দিনে একজায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া হয়ে পড়ে রীতিমতো বিপজ্জনক এক অভিযান।

যোগাযোগ ব্যবস্থা কার্যত অকার্যকর হয়ে পড়ে। মোবাইল টাওয়ারে সিগন্যাল থাকে না, বিদ্যুৎ থাকলেও খুব কম সময়ের জন্য। রাস্তাঘাটে জল জমে থাকে দিনের পর দিন। এমনকি প্রাথমিক চিকিৎসা, খাবার, বা শিশুদের জন্য দুধ জোগাড় করাও হয়ে পড়ে দুষ্কর। অনেক সময়, একজন রোগীকে নদী পেরিয়ে হসপিটালে পৌঁছাতে কয়েক ঘণ্টা লাগে। সেই সময় প্রকৃতি দাঁড়িয়ে থাকে নীরব, অথচ নির্দয়।

প্রতি বর্ষাতেই এই অঞ্চলে ট্রলার দুর্ঘটনার খবর শোনা যায়। মাছ ধরতে যাওয়া মাঝিদের কাছে বর্ষাকাল মানেই প্রতিদিন জীবন হাতে নিয়ে সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া। ইলিশ মৌসুমে দলে দলে ট্রলার যায় বঙ্গোপসাগরের দিকে। অনেকে ফিরেও আসে, অনেকেই আর ফিরে আসে না। মাঝসমুদ্রে ঢেউয়ের দাপটে ট্রলার ডুবে যায়, অথবা যান্ত্রিক ত্রুটিতে ট্রলার দিক হারায়। নেটওয়ার্ক না থাকায় সাহায্য চাওয়া যায় না, এবং বিপদের খবর গ্রামে পৌঁছাতে পৌঁছাতে অনেক দেরি হয়ে যায়। পরিবারের লোকজন ঘরে মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে বসে থাকে—"সমীর কি আজ ফিরবে?"

এই ফিরে আসার অপেক্ষা মাঝে মাঝে মাস পেরিয়ে যায়, আর অনেক সময় চিরকাল অপূর্ণ থেকে যায়। বাচ্চারা জানে, বাবার জুতোটা রাখা আছে দাওয়ায়, মা জানে, দরজার পাশের গামছাটা আর কেউ নেয় না। তবু তারা ছুঁয়ে দেখে—শুধু যদি একদিন ফিরে আসে।

বর্ষাকালে নদীতে ট্রলার ডুবি শুধু ব্যক্তিগত ক্ষতি নয়, এক সামাজিক দুর্দশার গল্প। প্রতিবছর প্রশাসনের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আসে—বায়োফেন্সিং হবে, রেসকিউ বোট থাকবে, সতর্কতা জারি থাকবে। কিন্তু বাস্তবায়নের অভাবে সেই সব উদ্যোগ প্রায় অকার্যকর থেকে যায়। বর্ষার প্রকোপ শুরু হলেই এই অজ পাড়াগুলো নিজেদের মত করে বাঁচার লড়াই শুরু করে দেয়—আশ্রয়কেন্দ্রে ঠাঁই নেই, ত্রাণের ব্যবস্থা অনিশ্চিত, এবং বিপদের সময় ডাক দেওয়ার মতো কেউ থাকে না।কিন্তু জীবন থেমে যায় না। নামখানার ছেলেরা বর্ষাতেও খালে জাল ফেলে মাছ ধরে, কিশোরীরা বৃষ্টির মধ্যে ভিজে স্কুলে যায়, কেউ কেউ আবার ঘর মুড়ে নিয়ে সাগরের দিক থেকে ফিরিয়ে আনা কাঠ জোগাড় করে পাকা বাড়ি বানানোর স্বপ্ন দেখে। কিছু মানুষ কাকড়া ধরতে যায় রাতের আঁধারে। তাদের সঙ্গে থাকে গামছা, একটা পুরনো টর্চ, আর ঈশ্বরের ভরসা। কাঁকড়া ধরার এই কাজ যেমন কষ্টসাধ্য, তেমনি রোমাঞ্চকর এবং বিপদসংকুল। জলের নিচে থাকে সাপ, গুইসাপ, আর অজানা শিকার। তাদের মুখোমুখি হতে হয় প্রতিদিন। প্রকৃতির সবচেয়ে ভয়ংকর রূপ তখনই দেখা যায়, যখন বাঘ ঢুকে পড়ে গ্রামে। বর্ষার রাতে চুপিচুপি বন বিড়াল, শুয়োর, বা বাঘ খালের পাড় পেরিয়ে চলে আসে জনবসতিতে। মাঝে মাঝে কারো মুরগি খোয়া যায়, কখনো গরু। আর অনেক সময় মানুষের জীবন। বাঘের পায়ের ছাপ পেয়ে যায় গ্রামের শিশুরা, ছবি তোলে, কিন্তু মুখে তেমন একটা হাসি দেখা যায় না। কারণ তারা জানে, রাতে সেই পথেই ফিরতে হয়।

নদীভাঙনের কথাও আলাদা করে বলতে হয়। প্রতি বছর কিছু ঘর নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় চুনকুড়ির পাড়ে। গেরি সাহেবের বাড়ি—যা একসময় একটা বড়ো স্থাপত্য ছিল—আজ শুধুই একটা স্মৃতি। লোকজন বলেন, "ওটা তো ছিল একসময়, বর্ষার পেটেই গেল।" এভাবেই প্রতি বর্ষায় কিছু ঘর হারায়, কিছু পরিবার ছিন্নমূল হয়। কেউ চলে যায় লোথিয়ান দীপের দিকে, কেউ কাজের খোঁজে কলকাতা কিংবা সাগরদ্বীপে। একবার ভিটে হারালে সেই পরিবার আর কখনও আগের মতো হয় না।

ছেলেমেয়েদের পড়াশোনাও চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নৌকার ব্যবস্থা না থাকলে স্কুলে যাওয়া যায় না। মেয়েরা অনেক সময় মাঝপথেই পড়াশোনা ছেড়ে দেয়। কিছু অভিভাবক শহরে পাঠাতে পারেন, কিন্তু যারা পারে না, তাদের স্বপ্ন বর্ষার কাদায় আটকে পড়ে।এই অবস্থার মধ্যে থেকেও মানুষ লড়ে যায়। উৎসব হয়, পুজো হয়, মাঠে পাঁপড় শুকোয়, ছেলেরা ফুটবল খেলে। কেউ কেউ ফোনে ভিডিও তোলে—বর্ষার জল, নদীর ঢেউ, কাকড়া ধরার মুহূর্ত। কেউ কেউ নিজের মোবাইলেই বানায় ছোট্ট তথ্যচিত্র—"এটাই আমাদের জীবন।" অথচ এই জীবনের মূল্যায়ন অনেক সময় প্রশাসন বা মূলধারার সংবাদমাধ্যম করে না। দুর্যোগ এলে টিভির পর্দায় ফুটে ওঠে বড় শহরের জলমগ্ন রাস্তাঘাট, কিন্তু সুন্দরবনের কোণায় বসে থাকা এই গ্রামের গল্প উঠে আসে না। নামখানার মানুষ নিজেরাই নিজের সংবাদ, নিজেরাই নিজের সরকার।তবু সন্ধ্যে হলে ঘরে ঘরে আলো জ্বলে। কেউ বলে, "আজ বৃষ্টি কম", কেউ ভাবে, "কাল ভাটা থাকলে নৌকাটা পেরোবে।" শিশুরা খাটে বসে গল্প শোনে—"তোর কাকু যখন মাছ ধরতে যেত, কী ঢেউ উঠতো জানিস!"বর্ষা এখানে এক ঋতু নয়—এক জীবনযাপন। এটি শিখিয়ে দেয় কিভাবে অনিশ্চয়তার মধ্যেও মানুষ বাঁচে, কিভাবে বিপদের মধ্যেও ছোট্ট আনন্দ খুঁজে পায়, আর কিভাবে একটি প্রদীপ জ্বেলে রেখে অপেক্ষা করে—যদি কেউ ফিরে আসে।এখানে বর্ষার জলে শুধু পুকুর, খাল নয়, মিশে থাকে গল্প, ইতিহাস, কান্না, প্রতিজ্ঞা আর অপেক্ষা।

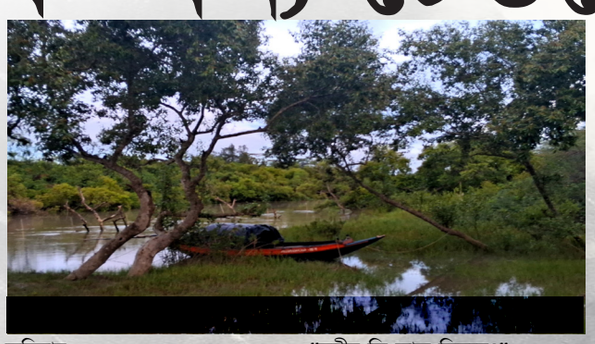

এটাই নামখানার বর্ষা। এখানে বৃষ্টি শুধু ভিজিয়ে দেয় না, মনে রচে এক অদ্ভুত শক্তি, যা দিয়ে মানুষ আবার গড়ে তোলে ভাঙা ঘর, আবার বানায় বাঁশের পোল, আবার পেরোয় নদী—এবং আবার ফিরে আসে ঘরে।

Rains bring nourishment and memories to life

Sangeeta Guha

Monsoon is not only about rain. Monsoon is also about some memories that make us feel nostalgic. I remember when it rained in my childhood, it was an extra holiday. If there was school that day and it was raining outside, it would have been an extra holiday. I personally like to stay at home during the monsoon. I think many people like to stay at home during this season, enjoy the rain, eat, listen to music, sleep. I have to travel by train to reach my university. During the monsoon, especially when it rains, I enjoy the train journey even more. Because when it rains outside and you are inside the train, it feels amazing and if you listen to some soothing songs, it feels even better. There was something else during the rainy months. When I was a kid, loadshedding was prevalent during the monsoon. In the evening, when it rained outside and then the electricity went off and if it happened during study time, it would turn into play time for us. But now, many things have changed. Actually adulthood changes everything. Load-shedding still happens. But our priorities have changed. Now when there is rain outside, I like to stay in a dark room peacefully, love to listen to music and enjoy gazing at the rain through the window. Many teenagers and kids love to play in the puddles during this time. Many adults like to play football on the muddy fields in the rain. That's why I said monsoon brings back memories, because now when it rains, these memories come to my mind. The rain cleanses everything, the leaves, the soil, nourishing the environment, the trees. That's why I mentioned nourishment. But the monsoon definitely has its bad effects when it rains heavily in the villages, because it results in flooding, dams break, causing problems for the people. While we enjoy the monsoon as a romantic, peaceful, comfortable season, for those who live in the villages, heavy rain is like a curse. Although farmers wait for the rainy season to harvest their crops, the government should pay attention to the people who face problems. Whatever its boon and bane, the monsoon plays a significant role in our lives.

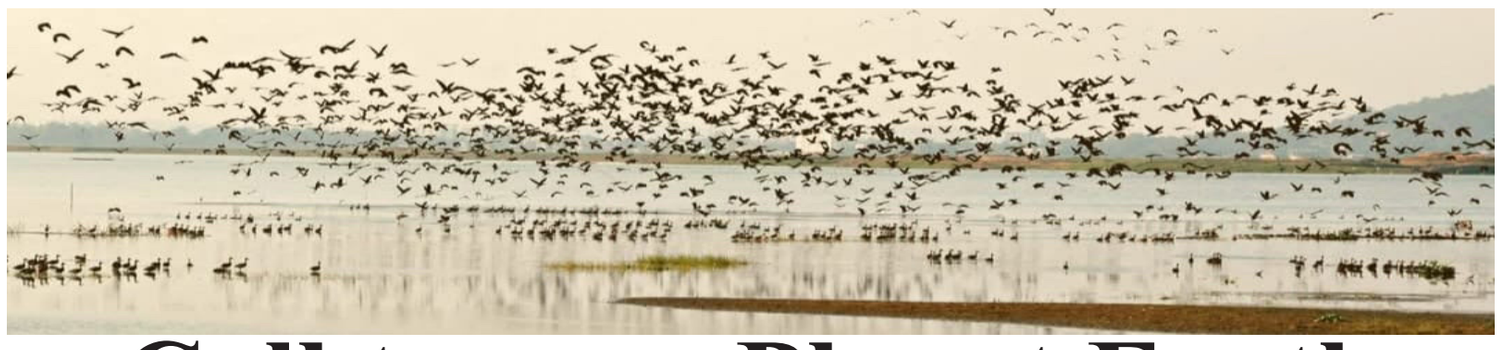

Call to save Planet Earth

Soumili Poddar

June 5 is celebrated as 'World Environment Day'. This day brings a powerful reminder that our planet is not a hub of endless resources. Rather, it is a shared home of all which needs our care. This day was established in 1972 by the United Nations and serves as the platform to raise awareness and take actions for the protection of our environment.

Every year over 150 countries participate and bring individuals, communities and governments together to address some of the most pressing ecological challenges of our time. The theme for this year was Restore our Earth, focusing on ecosystem restoration and climate resilience. From restoration campaigns to plastic bans, the goal was simple but also urgent, that was to revive the damage caused by human activities and to secure a sustainable life in future. I have seen my mother, along with some of her friends, making handmade carrybags from old or rough clothes. They sold these at a low price to the local citizens of New Barrackpore and most of them have stopped using plastic bags as a result. Also, the shops in the market of New Barrackpore have stopped giving plastic carrybags. Instead, they give the customers cloth carrybags whether it's a small fruit shop or a supermarket selling all kinds of products. The municipal workers looking after the cleanliness of the city have done a great job. They come on a regular basis to survey homes to check for mosquito larva to eradicate the threat of dengue. The supervisors, along with their men, visit all the area of New Barrackpore and look carefully at drains and accumulted water. If they find any mosquito larva, they immediately take the needful steps and ensure that they eradicate the linkage to keep the citizens of this city safe. Along with these actions, the garbage collectors and their supervisors ensure that the household-generated waste is dropped on the different sections allotted for dry and wet waste. Hence all this has made New Barrackpore one of the cleanest localities. World Environment Day is not just about planting trees or attending rallies — it is about adopting a mindset of stewardship. Every small act —carrying a cloth bag, avoiding single-use plastics — contributes to a broader culture of conservation. It is a day to reflect on our habits, acknowledge our impact, and reimagine our role in preserving the Earth. As we step into another year of environmental reckoning, the message is clear: we are not separate from nature — we are part of it. And it is only when we treat our planet with respect and compassion that we can hope for a healthier, greener tomorrow.

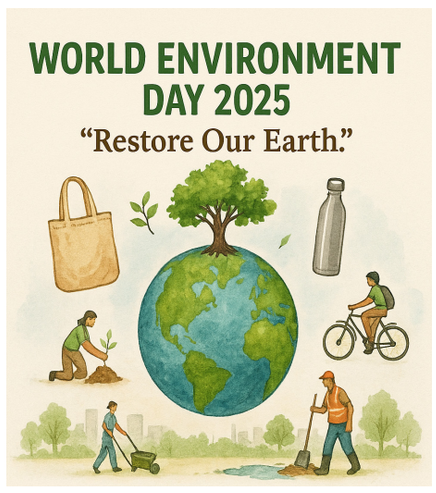

Eradication of lineage of the dengue mosquitoes by the workers of New Barrackpore Municipality and supervised by Basana Dutta (supervisor of ward number16)

The joys of internship

Anupriya Chakraborty

It will be a very fruitful opportunity for anyone to work in an organization like 'Prayasam.' Five students from MSc MSJ 3rd Semester, including me, got this opportunity to work at 'Prayasam' as interns. It is a different world in itself within this world of discrimination, inequality, and lack of opportunity, where they reach out to underprivileged children to fulfill their dreams, make them recognize their potential, and teach them so that they can come up with a better self and afterwards lead other children with the same idea of self-development.

When we hear the word NGO, the idea that comes to our mind is an organization helping marginalized people with some money and essentials, and with that follows the idea of superiority and minority in this society. But 'Prayasam,' with its developmental approach, changes the one-way idea of NGOs; it does not portray the compulsion of the marginalized people; they show how children are the root of the development of a society. They work with the idea that if children are taught educational and other life skills, they will ensure further development of their community and the future buds. They work in six dynamic enterprises—Prayasam Visual Basics, Prasad (community kitchen), Duoranir Shongshar (upcycle center), Kalanjali (art studio), Community Quick Call Service (home services), and Ontrack (life skill training institute) — 'Prayasam' has become a ray of hope, illuminating paths for youth seeking to break free from the shackles of marginalization and unemployment. Thus, in the vibrant core of Salt Lake City, Kolkata, 'Prayasam' is a transformative initiative that has been quietly rewriting the narratives of countless young and passionate lives. The thoughts, approach, and exquisite idea of 'Prayasam' are all possible because of the foresight of the founder and director of 'Prayasam,' Mr. Amlan Kusum Ganguly. In simple words, he is the heart of 'Prayasam,' who came up with his ideas and started this work 29 years back with 5 kids, and now he is enthusiastically torch-bearing around 7000 youth who are the future of this society, and I am sure his approach will bring a visible change among many marginalized communities.I am running out of words to say about 'Prayasam.' It is really difficult to summarize the vibrance this organization holds. To truly acknowledge the journey of 'Prayasam,' one needs to visit there, communicate with them, get to know about their journey from the very core, and feel the environment. It is not just an office to work for; it is beyond that. 'Prayasam' incorporates a different vision to look at our society. I hope we get to know 'Prayasam' more and engage with their work for the development of the youth.

The internship venue, Prayasam

Time to welcome the freshers

Prapti Biswas

As the semester came to an end, with heartbreaks and farewells to our beloved seniors, came the excitement of welcoming our freshers. As we become seniors ourselves, we are thrilled to share our department we call home with the new ones. We wish to create an environment that fosters love, friendship, creativity, and growth. Our small initiative will be to build a sense of belonging and enhance their academic journey with us. The interactions will help foster confidence and help them to smoothly transition to this new experience of college life.

We are delighted to be a part of their new beginning, witness new bonding, and share our wisdom with the new students. Our initiative will help to understand that there can be interactions among seniors and juniors without ragging. Interactions that will be fun and help them showcase their talents and interests.

We hope to set a positive and warm tone towards the newcomers who will soon consider the department as much as their home as we all do. We are beyond excited to guide, support, and cheer them. We are all looking forward to the amazing things we can all achieve together.

বারবার,একই ঘটনা, ধর্ষণ! কেন?

সঙ্গীতা গুহ

দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ধর্ষণ ক্রমশ ভয়াবহ হয়ে উঠছে। কোথাও বাবা তার মেয়েদের ধর্ষণ করছে, কোথাও মা প্রেমিককে তার 13 বছর মেয়ের গণধর্ষণ করার অনুমতি দিয়েছে, কোথাও কলেজের প্রাক্তন ছাত্ররা জুনিয়র ছাত্রীদের গণধর্ষণ করছে, এমনকি কয়েকবছর আগে একটা ছেলেকেও যৌন হয়রানির শিকার হতে হয়েছিল প্রাক্তন ছাত্রদের হাতে এগুলোই প্রমাণ করে মানুষ-এর নোংরা মানসিকতা আর তাদের নৃশংসতা। এমনকি কর্মক্ষেত্রে কোনো নিরাপত্তা দিতে পারে না রাজ্যের সরকার, খুন ধর্ষণ হয়ে যাচ্ছে কাজের জায়গায়।

তাহলে তারপর কী হচ্ছে? একের পর এক নতুন ধর্ষণের কেস আসছে আর পুরোনো কেস চাপা পড়ে যাচ্ছে নতুন কেসের নীচে, আর সেই বিচার না পাওয়াই থেকে যাচ্ছে নির্যাতিতার জন্য। ধর্ষণ করা, আর ধর্ষককে সাহায্য করা দোষ একই। কিন্তু একজন বাবা তার মেয়েদের ধর্ষণ করার মতো পর্যায়ে নেমে গেলে তাকে কী বলা উচিত সত্যিই জানা নেই। আবার এই সমাজে মা তার মেয়েদের সাথে হওয়া ধর্ষণ জেনেও চুপ, বা ধর্ষণ করার অনুমতি দেয়, এনারা কীরকম বাবা মা আমার জানা নেই। সমাজে মানুষ কত নিষ্ঠুর হলে যৌন নির্যাতন-এর মতো অপরাধ করে। হ্যাঁ সব মানুষ সমান হয়, সব মানুষ এরকম হয় না ঠিক, কিন্তু এরকম অপরাধ করছে তো সেই মানুষই না!!

এই ধর্ষণ যে নতুন এখন থেকে শুরু হয়েছে তা একদমই নয়, বহু যুগ থেকে যৌন নির্যাতনের ঘটনা ঘটে আসছে, তফাত একটাই এখন সবাই জানতে পারছে, আগে কেউ জানতে পারতো না, তখন মেয়েরা লজ্জায় বলতে পারত না। এখন সেই লজ্জাটা তারা আর পায় না, আর তার সাথে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে মানুষ জানতেও পারছে। কিন্তু একটা জিনিস একই থেকে গেছে বিচার না পাওয়া, আগেও সেই ধর্ষিতা বিচার পেত না আর এখনও পায় না, এই তথাকথিত সমাজে এই জিনিস টা একই রয়ে গেছে।

এবার বলার কেন বারবার এই ঘটনা ঘটেই চলেছে, কে দায়ী, আদৌ কী কেউ এর দায় নেবে? নাকি খালি ধর্ষকেরা এরকম বাইরে খোলা ঘুরে বেরাবে??

কেন হয়, কে দায়ী যদি বলি তাহলে অনেকের উত্তরে আসবে মেয়েটা কোথায় ছিল, মেয়েটা কী পড়েছিল, রাতে কেন একা বাইরে ছিল?? আরে মশাই একটা ছোট্ট বাচ্চা মেয়েকে যেখানে ধর্ষণ করা হচ্ছে সেখানে কী এই প্রশ্নগুলো সত্যিই যুক্তিযুক্ত?? একটা ছেলে সেটা বাবা হোক বা বন্ধু বা প্রেমিক বা অচেনা ছেলে যেই হোক না কেন তাঁকে কে অধিকার দিয়েছে মেয়েদের দিকে বাজে দৃষ্টিতে তাকানোর, তাঁকে যৌন নির্যাতন করার, তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁকে বাজে স্পর্শ করার। তাহলে তো দাঁড়ায় সমস্যা সেই মানুষগুলোর যারা এইরকম ভাবে দেখে মেয়েদের, যারা এইরকম করে মেয়েদের সাথে, তাদের মানসিকতার, তাদের মস্তিষ্কের । যদিও সমাজে একটা প্রথা আছে যাই হয়ে যাক না কেন দোষ সেই মেয়েদেরই হয়, এই প্রথার পিছনের যুক্তিও বুঝতে পারি না। কেন সবসময় সব দোষ মেয়েদের?? যেখানে বড় বড় কথা বলা হয় নারী পুরুষ সমান সমান। যদিও নারী পুরুষ সমান সমান বললেও সেইরকম দেখা খুব কম যায় এই সমাজে, সেটা তো এই নারীরাই যারা নিজেদের সবসময় পুরুষদের থেকে এগিয়ে রাখে। খালি এই একটা জায়গা যেখানে নারীরা এই অত্যাচারের সম্মুখীন হয়। তার কারণ সেই সব নীচ মানুষদের শিক্ষা, মানসিকতা তার সাথে আরও একটা কারণ হল ভয়, এই ভয় হলো শাস্তি পাওয়ার ভয় যেটা কোনো ধর্ষক, খুনিদের মনে নেই। আমি অবাক হই ভারতে মেয়েদের সাথে হওয়া এই জঘন্য অপরাধের কোনো যথোপযুক্ত শাস্তি নেই, কেন আজ পর্যন্ত কোনো ধর্ষককে ফাঁসিতে চড়াতে পারে না ভারতের আইন ব্যবস্থা? খালি দিনের পর দিন তারিখ পিছিয়ে দেওয়া হয় আর শেষে গিয়ে কোনো বিচার পায় না ধর্ষিতারা। একটা অপরাধী যে ধর্ষণ করার মতো অপরাধ করা সে কী ফাঁসির মতো শাস্তির প্রাপ্য নয়, তাই মনে করে ভারতের আইন ব্যবস্থা, ভারতের, রাজ্যের সরকার? শুধু লোক দেখানো গ্রেপ্তার করে কয়েকদিনের জন্য জেলে রেখে দেওয়া কী যথেষ্ট শাস্তি একটা ধর্ষকের জন্য? আমি মনে করি না, যারা এত জঘন্য অপরাধ করে তাদেরও মরার কষ্ট বোঝা উচিত। রাজ্যে, ভারতে এক একজন অপরাধী রাজনীতিকদের ছায়ায় থেকে এইসব জঘন্য অপরাধ করার পরও বেঁচে যাচ্ছে এগুলো কী সত্যি মেনে নেওয়ার মতো। ভীষণ ভাবে চাই ধর্ষকদের ফাঁসি দেওয়ার আইন চালু করা হোক। ধর্ষণ ফাঁসি দেওয়ার মতোই একটা ভয়ঙ্কর অপরাধ। আর যদি ধর্ষকদের ফাঁসি দেওয়ার আইন শুরু না করা হয় তাহলে সেই নৃশংস মানুষ যারা এই অপরাধ করে বা এর সাথে জড়িত থাকে তাদের এইভাবে ছাড়া দেখে, শাস্তি না পেতে দেখে আরও সাহস বাড়বে ভবিষ্যতের ধর্ষক বা অপরাধীদের যাতে শুধু ক্ষতি মেয়েদের হবে না পুরো দেশের হবে কেউ ঘুরে তাকাতে চাইবে না এই দেশের দিকে যেখানে দেবীদের পুজো করে কিন্তু সাধারণ মেয়েদের জন্য নিরাপত্তা নেই। ভাবলেও অবাক লাগে যেই দেশকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু স্বাধীন করেছিলেন সেই দেশে মেয়েদের স্বাধীনতা বারবার প্রশ্নের মুখে পড়ছে, মানে কোথায় নেমে যাচ্ছে দেশের মান।

এরপর একটাই কথা বলা যায় এখানে কেউ নেই মেয়েদের নিরাপত্তার জন্য এখন একটাই উপায় মেয়েদের নিজেদের সুরক্ষার অস্ত্র তুলে নিতে হবে নিজেদের হাতে, তাদের মারতে জানতে হবে, কিছু ধারালো জিনিস বা লঙ্কার গুঁড়োর মতো জিনিস নিয়েই রাস্তায় বেরোতে হবে তাঁদের। আর এরপর যদি মেয়েদের দিকে আঙ্গুল ওঠে যে কেন মেয়েটা ছেলেটা বা বিপরীতে যেই থাকবে তাঁকে কেন আহত করেছে তাহলে তো বলা উচিত আত্মরক্ষা অপরাধ নয়, বরং আত্মরক্ষার জন্য নিজে থেকে সেই ব্যক্তিকে আক্রমণ করা এই সমাজে সবথেকে বেশি দরকার। আইন যখন সেই সব ধর্ষকদের শাস্তি দিতে পারে না, তখন আত্মরক্ষাকারী মেয়েদেরও শাস্তি দিতে পারে না। সত্যিই জানি না আইন আইনের মতো কোনোদিন কাজ করবে কিনা কিন্তু ভবিষ্যতে যারা বড় হবে তাদের শেখানো শুরু করা উচিত এখনকার বাবা-মায়েদের কীভাবে নিজেদের রক্ষা নিজেরা করবে, কীভাবে মেয়েদের দিকে তাকানো উচিত, কীভাবে তাদের সম্মান করা উচিত, কীভাবে তাদের সাথে ব্যবহার করা উচিত।

তারপরও বলবো বিচার ব্যবস্থা কড়া হোক, আইন কড়া হোক সেই সব অপরাধীদের জন্য যারা শাস্তি ছাড়া আর কিছুর যোগ্য নয়। দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কড়া হোক, শুধু মেয়েদের জন্য নয় ছেলেদের জন্যও নিরাপত্তা শক্ত করা প্রয়োজন। রাজনীতির আড়ালে সবকিছু ঢাকা পরা বন্ধ হোক। বিচার হোক, বিচার পাওয়া তাঁদের অধিকার।

বেনারসে আবার কোন বিপদে একেন বাবু?

অস্মিতা দেবনাথ

"আবার কাকাবাবু, ফেলুদা না ব্যোমকেশ, এইবার সোজা একেন বাবু!"

বাংলা সাহিত্যের গোয়েন্দা চরিত্র গুলোর মধ্যে ফেলুদা আর ব্যোমকেশ যতটা গম্ভীর আর বিশ্লেষণধর্মী, একেন বাবু ততটাই অদ্ভুত, অপ্রত্যাশিত ও মজাদার। তার বুদ্ধিদীপ্ত কিন্তু কৌতুকমিশ্রিত গোয়েন্দা গিরী বাংলা চলচ্চিত্রে নিয়ে এসেছে এক নতুন ধারা।

২০২৪ সালে এপ্রিল মাসে মুক্তি পেয়েছে The Eken Beranas e - Bibhishika, যা এই সিরিজ এর তৃতীয় কিস্তি। ছবিটি মুক্তির পর থেকেই দর্শকমহলে প্রশংসার ঝড় উঠেছে এবং এটি বক্স অফিসে ও চমকপ্রদ সাফল্য অর্জন করেছে। ছবির গল্প এক রহস্যময় চিত্রকল্প চুরির ঘটনার উপর ভিত্তি করে, যার কেন্দ্রে রয়েছে আমাদের প্রিয় একেন বাবু।চলচ্চিত্রটি পরিচালনা করেছেন জয়দীপ মুখোপাধ্যায়, যিনি এর আগেও আগের সিরিজ এর ছবিগুলো সাফল্যের সাথে পরিচালনা করেছেন। পরিচালনায় রয়েছে জনপ্রিয় প্রোডাকশন এসভিএফ, বাংলা প্রযোজনায় একধিক জনপ্রিয় চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে।একেন বাবু র ভূমিকায় আবার রয়েছেন অনির্বাণ চক্রবর্তী। তিনি এই চরিত্রকে এমন ভাবে রূপায়ণ করেছেন, যা যেন বইয়ের পাতা থেকে সরাসরি সিনেমার পর্দায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তার সংলাপ, হাস্যরস ও ক্ষুরধার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা আবার ও প্রমাণ করে দিয়েছে এই চরিত্রটি শুধু কল্পনা নয়, বাঙালির আবেগের অঙ্গ।ছবির কাহিনী শুরু হয় এক পরিচিত ছুটি কাটানোর পরিকল্পনা দিয়ে। একেন বাবু প্রমথ আর বাপি গিয়ে হাজির হন বারাণসী তে - ভারতের অন্যতম প্রাচীন ও ধর্মীয় দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ শহর। গঙ্গার ধারে বসে চা খাওয়া, মন্দির দর্শন আর ইতিহাসে ভরা অলিগলিতে হেঁটে বেড়ানো - সব মিলিয়ে এক নিখাদ ছুটির পরিবেশ।

কিন্তু চুপচাপ ঘুরে বেড়ানোর পরিকল্পনা আর বেশিদিন স্থায়ী হয় না। আচমকা ঘটে যাওয়া শিল্পকর্ম চুরির ঘটনা প্রেক্ষিতে, একেন বাবু আবার গোয়েন্দার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। এই রহস্যের সূত্র ধরেই গল্প এগোই বারাণসীর এক গোপন ইতিহাস ও চক্রান্তের দিকে।

গল্পটি যত এগোয় ততোই তা গভীর ও টানটান হয়ে ওঠে। পুরোনো ইতিহাস, ধর্মীয় প্রতীক, রাজনৈতিক সম্পর্ক - সবকিছু মিলে একটা জটিল কিন্তু রোমাঞ্চকর থ্রিলার হয়ে ওঠে এই সিনেমা টা।অনির্বাণ চক্রবর্তী আবার ও প্রমাণ করলেন কেনো একেন বাবু চরিত্রটির জন্য উনি পারফেক্ট। তার হাস্যরস, বাঙালিয়ানা, অদ্ভুত বুদ্ধি আর সহজাত চঞ্চলতা দর্শকদের মন ভরিয়ে তোলে।জয়দীপ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনা আগের ছবি গুলোর মত সাবলীল। গল্পে রহস্য ও কমেডি সঠিক মিশ্রণ রক্ষা করা সহজ কাজ নয়, কিন্তু তিনি তা নিপুণভাবে করেছেন।

চিত্রগ্রহণে বারাণসীর প্রকৃত সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। গঙ্গার ঘাট, সংকীর্ণ অলিগলি, প্রাচীন মন্দির - সবকিছুই যেন পর্দায় প্রাণ পায়। বানারাস যেন পটভূমি হয়, বরং গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হয়ে উঠেছে। ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর রহস্যের আবহ তৈরি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। বিশেষত ক্লাইম্যাক্স ও ধরা পড়ার মুহূর্তগুলোর আবহসংগীত সিনেমাটিকে এক অন্যমাত্রায় পৌঁছে দেয়। গান খুব বেশি নয়, তবে যা আছে গল্পের সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ।ছবিটি মুক্তি পাওয়ার পর থেকেই দর্শকমহলে সোশ্যালমিডিয়ায় ব্যাপক সাড়া পড়েছে। কেউ লিখেছে ' শেষ পর্যন্ত বাংলার গোয়েন্দা চরিত্রও হাস্যরস থাকতে পারে, তা একেন বাবু ছাড়া বোঝা যেত না", আরেকজন বলেছেন " ছবির রহস্য যেমন টানটান ছিল, তেমনই বেনারস কেও খুবই সুন্দর দেখানো হয়েছে।"একেন বাবু চরিত্রটি মূলত লেখক সুজন দাশগুপ্তের সৃষ্টি।

এই সিরিজের এটি তৃতীয় সিনেমা তার আগের দুটি - 'The Eken' ও 'The Eken: Ruddhaswas Rajasthan'- ও জনপ্রিয়তা পেয়েছে।পুরো ছবির শুটিং হয়েছে আসল জায়গায় বারাণসীর ঘাট, মন্দির ও গলিতে। ছবির নাম 'বিভীষিকা' হলেও তা ভবিষ্যতের পূর্বাভাস নয়, টা বরং একটি ঘটনার অন্ধকার ভবিষ্যতের ইঙ্গিত।'The Eken: Baranas-e Bhivishika' এটি একটি শুধু রহস্যময় চরিত্র নয়, এটি একটি মনোরঞ্জক ভ্রমণ, একটি ঐতিহাসিক শহরের মধ্য দিয়ে রহস্য ও রসের অপূর্ব মিশ্রণ।

যারা গোয়েন্দা গল্প ভালবাসেন, অবশ্য একটু হালকা মেজাজে তাদের জন্য এই সিনেমা একেবারেই পারফেক্ট। "বারাণসীতে রহস্যেভরা অলিগলিতে তদন্তে একেন বাবু"।

Honouring Stanley Kubrick (July 26,1928)— the mastermind behind *The Shining, 2001, and A Clockwork Orange*.

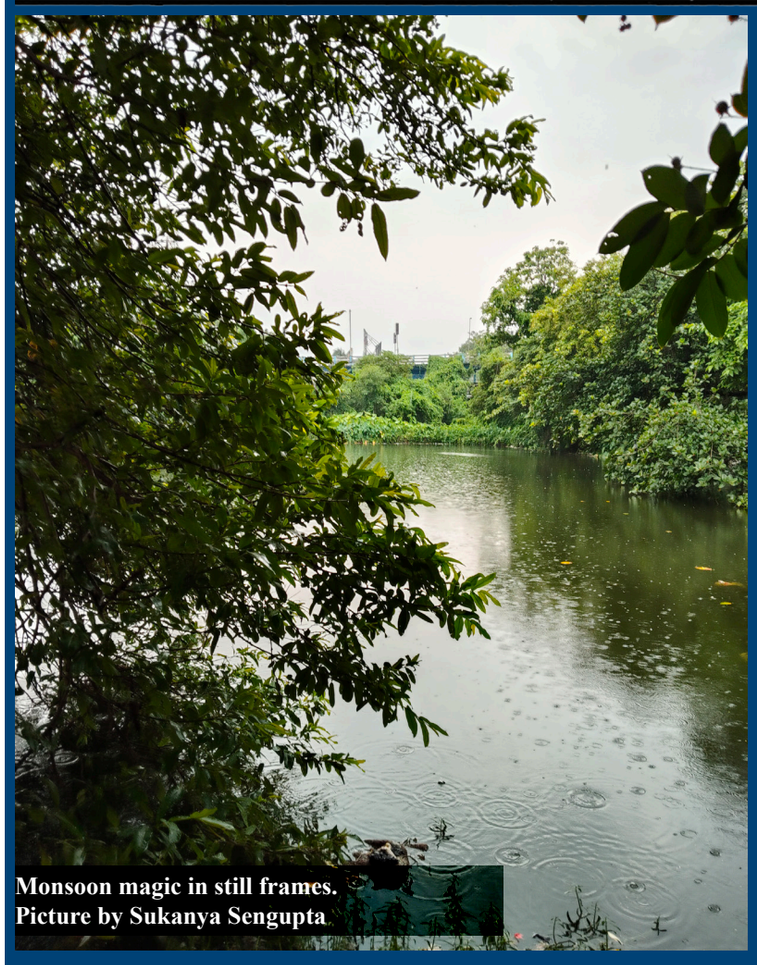

Monsoon magic in still frames.
Picture by Sukanya Sengupta

A beautiful night view of Howrah Bridge.
Picture by Rupsa Khanra

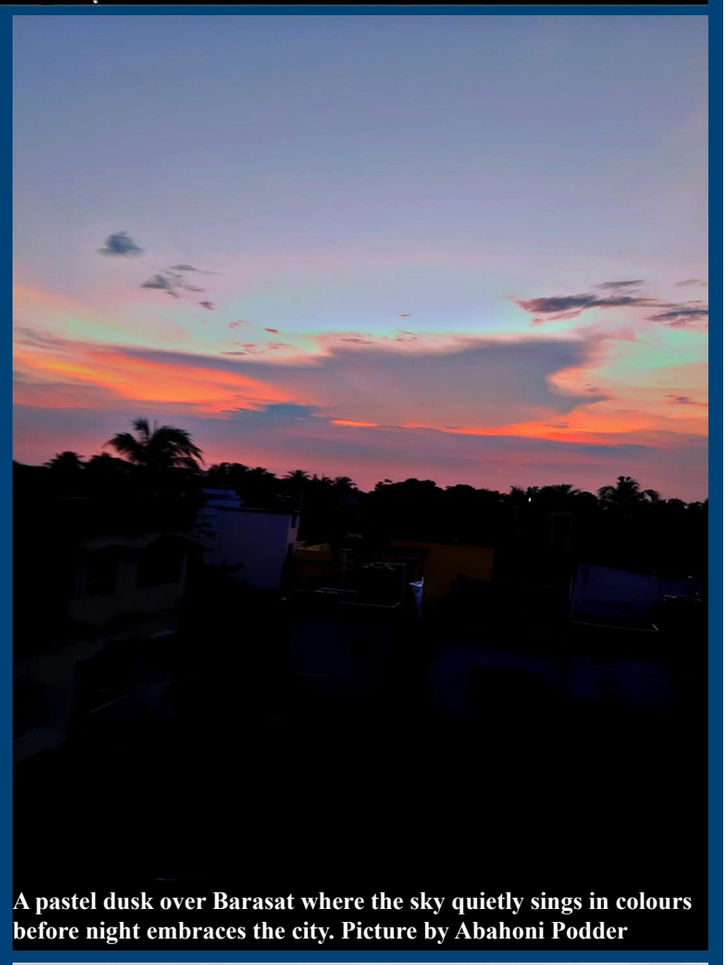

A pastel dusk over Barasat where the sky quietly sings in colours before night embraces the city. Picture by Abahoni Podder

দূরে ওই আকাশে, মেঘের বুক চিরে উঠে দাঁড়িয়েছে কাঞ্চনজঙ্ঘা ।
ছবি- দিশা মজুমদার

নীল আকাশের নিচে সোনালী চাদোরে মোড়া এক সকাল।
ছবি - নন্দিতা মহাপাত্র

A bustling street on a rainy day.
Picture by Ahona Roy

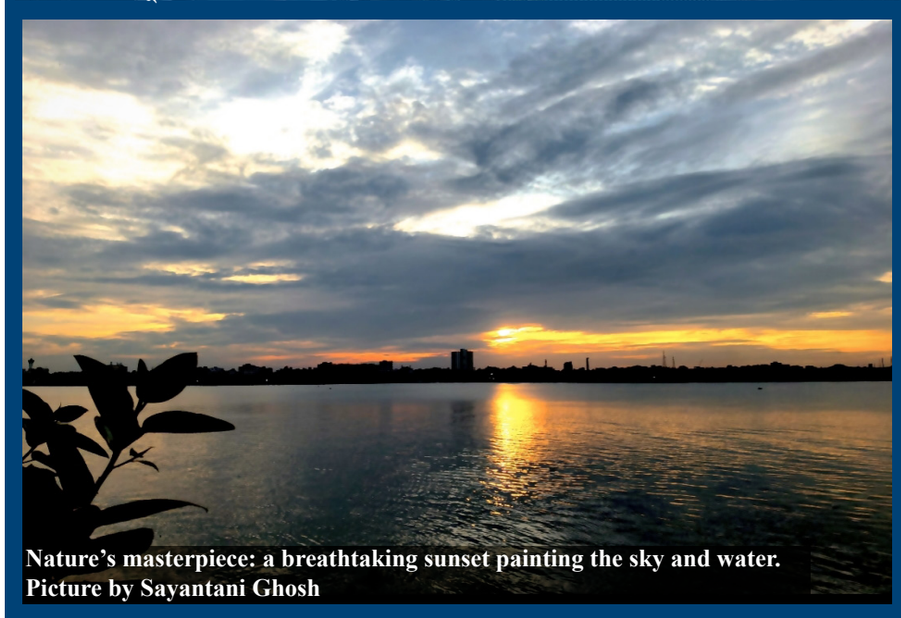

Nature's masterpiece: a breathtaking sunset painting the sky and water.
Picture by Sayantani Ghosh

Rathyatra vibes with Lord Jagannath's blessings lighting the streets.
Picture by Ranodip Saha

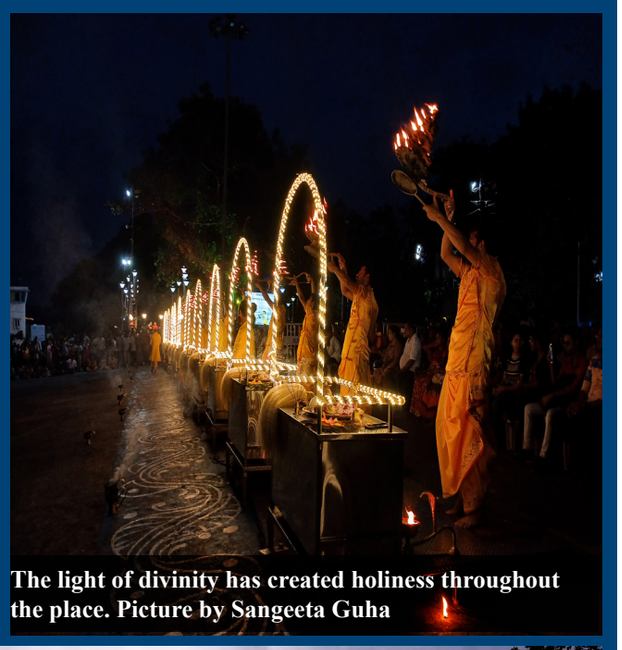

The light of divinity has created holiness throughout the place. Picture by Sangeeta Guha

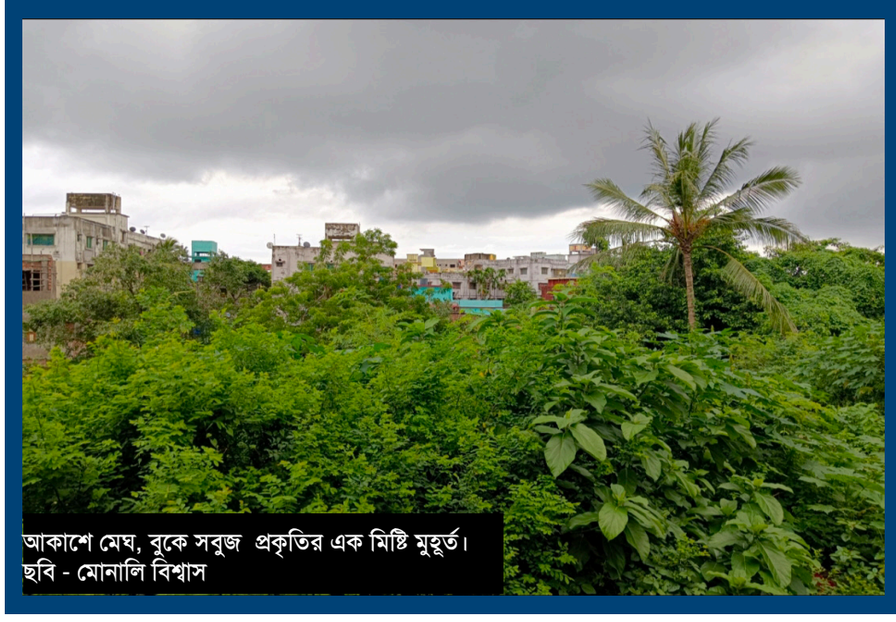

আকাশে মেঘ, বুকে সবুজ প্রকৃতির এক মিষ্টি মুহূর্ত।
ছবি - মোনালি বিশ্বাস

দৃষ্টিতে তেজ, খাবারে রাজত্ব!
ছবি - ইন্দ্রানী দত্ত

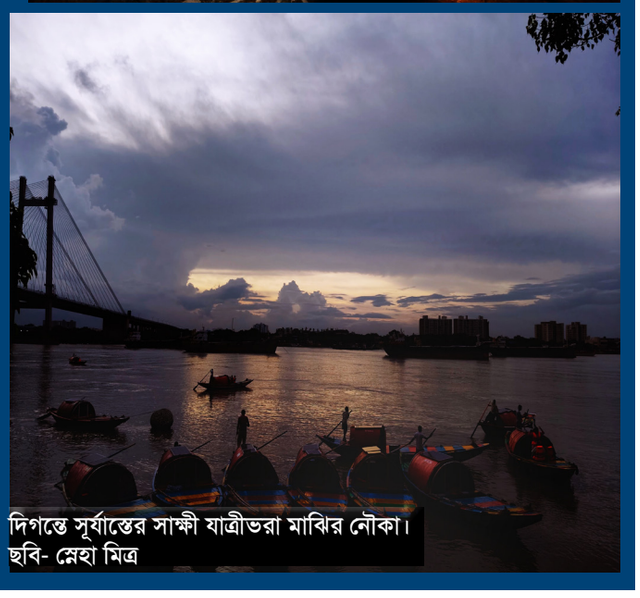

দিগন্তে সূর্যাস্তের সাক্ষী যাত্রীভরা মাঝির নৌকা।
ছবি- স্নেহা মিত্র

মিথ ভাঙ্গার মাস.....

শিউলি মণ্ডল

গুকেশের কাছে পরাজিত কার্লসেন

ম্যাগনাস, একটি মিথের নাম। অন্তত দাবার দুনিয়ায় তো বটেই। ম্যাগনাস নাকি ঘুরতে ঘুরতে যে কোনও দাবা টুর্নামেন্টে ঢুকে যান, কয়েক চাল খেলেন আর নিমেষে প্রতিপক্ষকে ধূলিসাৎ করে জয়ী হয়ে আসেন; এমনটাই গত কয়েক বছরের প্রচলিত কিংবদন্তী। অনেকটা জুলিয়াস সিজারের মতোই ম্যাগনাস কার্লসেন চেস দুনিয়ার অলিখিত সম্রাট। যার জিতে যাওয়ার ঘটনা এতই সাধারন যে সেই নিয়ে আর খবর হয়না। খবর হয় তার হেরে যাওয়া নিয়ে। খবর হয়, হেরে গিয়ে তার টেবিলে ঘুসি মারা নিয়ে। আর সেই খবরটাকে সম্ভব করে তোলে ১৯ বছর বয়সী ভারতীয় দাবাড়ু গুকেশ ডোম্মারাজু।

যে বহুবার কার্লসেনকে ইনস্পিরেশন বলেছে সর্বসমক্ষে, "আমি বিশ্ববিজেতা হতে পারি, কিন্তু ম্যাগনাস এখনও শ্রেষ্ঠ।" যদিও কার্লসেন গুকেশকে ধর্তব্যের মধ্যেই রাখেননি কখনও। কখনও বলেছেন 'ফ্লুক', কখনও হেসেছেন বিদ্রুপের ভঙ্গীতে। এই টুর্নামেন্টের আগের ম্যাচেই গুকেশকে হারিয়ে টুইট করেছেন, "হোয়েন ইউ কাম ফর দ্য কিং, ইউ বেটার নট মিস" ।

গুকেশ মিস করেনি। নরওয়ে ক্ল্যাসিক্যাল চেসের ষষ্ঠ রাউন্ডে বরাবর এগিয়ে থেকেও শেষদিকে নেহাত ভুল চাল; নিজের জিতকে ত্বরান্বিত করতে গিয়ে গুকেশকেই জিতিয়ে দিলেন ম্যাগনাস। তেমনটাই বলছেন দাবা বিশেষজ্ঞরা। তবে কি গুকেশের নিজস্ব কোনো ক্রেডিট নেই এই জিতে যাওয়ায়? আলবাত আছে। তবে দাবার চালের থেকেও অনেক বেশি ক্রেডিট নার্ভের ওপর নিয়ন্ত্রনে। শেষ চালে গুকেশ যত না জিতেছেন, তার চেয়ে বেশি জিতেছেন সেই মুহূর্তে যখন ম্যাগনাস ফ্রাস্টশনে টেবিল চাপড়ে উঠে গেছেন আর গুকেশ বরাবরের মতো শান্ত থেকে গুটি সাজিয়েছেন চেস বোর্ডে।

২০১৩ সালে পাঁচবারের ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন বিশ্বনাথন আনন্দকে হারিয়ে নতুন চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন ২১ বছর বয়সী ম্যাগনাস। বলেছিলেন, "শেষদিকে মনে হচ্ছিল আনন্দ ও মানুষ, সে ও হারতে পারে" । ২০২৫-এ আনন্দের উত্তরসূরি যেন সেই ঘটনা-র মধুর প্রতিশোধ নিলেন। বুঝিয়ে দিলেন ম্যাগনাস মিথ হলেও মানুষ। ম্যাগনাস ও হারতে পারে। এবং সেটা যে নিছক দুর্ঘটনা নয়, তা প্রমাণ হল ৩-রা জুলাই, আবারও গুকেশের কাছে কার্লসেনের পরাজয়ে। কয়েকটি পরাজয় দিয়ে যদিও ম্যাগনাসকে মাপা যায়না, তবু তার 'ইনভিন্সিবিল আর্মারে' সামান্য ক্ষয়টাও 'খবর' বই কি!

ই সালা কাপ নামদু

আইপিএল দর্শকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যে দলটাকে নিয়ে বিগত ১৮ বছরে ঠাট্টা-তামাশা হয়েছে, তার নাম আরসিবি। যে দলের সমর্থকরা প্রতি বছর অন্য দলের সমর্থকদের সাথে বাজি ধরেছে "ই সালা কাপ নামদে" (এই বছর কাপ আমাদের হবে) বলে, বাজি হেরেছে, ঠাট্টার বিষয় হয়েছে আর দাঁতে দাঁত চেপে নিজেদের বলেছে, "সামনের বার ঠিক হবে" ।

এই একই কথা বোধহয় নিজেকে বারবার বলেছেন বিরাট কোহলি। ক্রিকেটে ক্যাপ্টেন হিসেবে কিং কোহলি-র ভাগ্য কিঞ্চিত খারাপ-ই। প্লেয়ার হিসাবেও অন্য কাপগুলি জয় করলেও আইপিএল ট্রফির স্বাদ ১৮ বছর ধরে অধরাই রয়ে গেছিল বিরাটের। মাঝে কতবার ক্যাপ্টেন বদল হলেও আরসিবির ভাগ্য বদল হয়নি। তবু দল বদলাননি বিরাট; যিনি চাইলেই হয়তো যে কোনো দল যে কোনো মূল্যে তাঁকে পাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠত। আসলে বিরাট কোহলি আরসিবি নামক দলটির ধ্রুবতারা। স্থির হয়ে যিনি রাস্তা দেখিয়ে গেছেন। যার হাতে আইপিএল কাপটা দেখার জন্য কোটি-কোটি ভক্তরা অপেক্ষা করেছে। ক্যাপ্টেন রজত পাতিদার হলেও দলনেতা তাই বিরাট-ই রয়ে গেছেন।

৩-রা জুন যখন ১৮ বছরের সমস্ত ঠাট্টা-তামাশা অপমানের উত্তরে সমস্ত অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে আরসিবি কাপ জিতল, তখন কেন্দ্রবিন্দু বিরাটের অশ্রু সাক্ষী দিচ্ছিল, অপেক্ষাটা ঠিক কতটা তীব্র ছিল।

২০২৫-এর যোগ্য দল হিসেবেই আরসিবি জিতেছে কিন্তু অন্য বারের সাথে তফাৎ ছিল বোধহয় খানিক হলেও ভাগ্যের। কথায় বলে, "ভাগ্য সর্বদা বীরের সহায় হয়" । এ ক্ষেত্রে অবশ্যই ভাগ্য বিরাটের সহায় হতে বাধ্য হয়েছে। কারণ শুধু ব্যাঙ্গালুরু ফ্যানরাই নয়, আপামর দেশবাসী প্রার্থনা করছিল ভারতীয় ক্রিকেটের কিং-এর জন্য।

অবশ্য আরও কয়েকজনের এই জয়ী আরসিবি দলে থাকাটা ভক্তদের জন্য আরও সুখকর হতে পারত, যেমন এবি ডেভিলিয়ার্স, ক্রিস গেইল ইত্যাদি। তাহলে হয়তো সমর্থকরা আরও আনন্দের সাথে বলতে পারত, "ই সালা কাপ নামদু" (এ বছর কাপ আমাদের হয়েছে) ।

জয়ের মাঝেও জয়ী দলের তারকাদের দেখতে এসে পদদলিত হয়ে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু মিশিয়ে দিয়েছে বিষাদের সুর। সাফল্য উদযাপন স্থগিত হয়েছে। তবু সবের মাঝেও ভেঙ্গে গেছে "আরসিবি-র ট্রফি না জিততে পারার" মিথ।

চোকার্স থেকে চ্যাম্পিয়ন

২৭ বছর পর যে দক্ষিণ আফ্রিকা আবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হতে পারে, এই কথাটা প্রায় ভুলতে বসেছিল ক্রিকেট বিশ্ব। বিগত ২৬ বছর ধরে "চোকার্স" পদবী বইতে বইতে হয়তো দক্ষিণ আফ্রিকার জনগণও বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল যে জয়ের খুব কাছে গিয়ে হেরে যাওয়াটাই এই দলের নিয়তি।

অথচ বিগত তিন দশকে এই দলেই উদ্ভাবন হয়েছে বিশ্ব ক্রিকেটের তাবড় তাবড় প্রতিভাদের। গ্রেম স্মিথ, এবিডি, ডেল স্টেইন, শন পোলক; এরা প্রত্যেকেই 'হয়তো' জিততে পারতেন একাধিক আই সি সি ট্রফি। পারেননি। বরং এই তিন দশকে প্রোটিয়া বাহিনী চোকার্স হিসেবে নিজেদের স্বীকার করতে শুরু করেছে।

অবশেষে সেই বদনাম ঘুচল এমন একজনের হাত ধরে, যাকে নিয়ে ক্রিকেট দুনিয়ায় কথা প্রায় হয়েইনা। হলেও সেই কথা তার খেলার রেকর্ডের চেয়ে অনেক বেশী তার গায়ের রঙ, শারীরিক উচ্চতা নিয়ে। তাই ১৪-ই জুন বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে শুধু দল হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকা জেতেনি, ব্যক্তিগতভাবে জিতে গেছেন টি বাভুমা।

টেম্বা বাভুমা ক্রিকেটে পা রাখার আগে থেকেই আফ্রিকা-র কৃষ্ণাঙ্গ ক্রিকেটারদের কপালে জুটেছে 'রিজার্ভেশনের' খোঁটা। বাভুমা ব্যাতিক্রম নন সে ক্ষেত্রে। আফ্রিকার বিখ্যাত শ্বেতাঙ্গদের স্কুল তাঁকে Prodigious Talent আখ্যা দিয়ে রাস্তা থেকে তুলে না নিয়ে গেলে হয়তো খেলাই হতো না তার। ২০১৬-এ আফ্রিকার প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ ব্যাটার হিসেবে প্রথম সেঞ্চুরি। গত পাঁচ বছরে তাঁর টেস্ট গড় ৪৬+। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৯৫ রান, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৮৯ রানের ইনিংসের পরেও বাভুমা বিশ্বের ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ বা মিডিয়ার কাছে "বড় খেলোয়াড়" হয়ে উঠতে পারেননি।

বাভুমাকে নিয়ে উইসডেনের একটি রিপোর্টে জানা যায়, টেম্বা বাভুমা কেপটাউনের বাইরে যে রাস্তায় ধুলোমেখে ক্রিকেটটা খেলতেন সেখানে চারখানা রাস্তা এসে মিলত। একটা রাস্তা ছিল উঁচু-নিচু, সকলে নাম দিয়েছিল করাচি, অন্য রাস্তাটিতে ছিল সদ্য পিচ ঢালা- মেলবোর্ন, আর সবচেয়ে সুন্দর সমান রাস্তাটির নাম ছিল লর্ডস- যে রাস্তায় মাঝে মধ্যে ব্যাট করার সুযোগ পেতেন তিনি, আর অপেক্ষায় থাকতেন কবে সেই লর্ডসে আবার খেলার সুযোগ পাবেন- বাভুমা স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলছেন - 'ভাবতে পারেন, ঐ মসৃণ রাস্তা, যার নাম দিয়েছিলাম লর্ডস, সেখানে খেলার একটা সুযোগ পাবার জন্য আমি অপেক্ষা করে থাকতাম আর আজ, আমি আফ্রিকার অধিনায়ক হিসেবে আসল লর্ডসে নামব!'

শুধু নামা নয়, সেই লর্ডসে ইতিহাস গড়ে এলেন বাভুমা। যেই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৯৯৯-এ হারার পর থেকে চোকার্স পদবী বয়ে বেড়িয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। সেই অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েই চ্যাম্পিয়ন হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। আর বাভুমা? তিনি তো নেলসন ম্যান্ডেলার দেশের সেই নাগরিক, যার ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি উচ্চতার সামনে যাবতীয় বৈষম্য নুয়ে পড়তে বাধ্য। "কোটার প্লেয়ার" তকমা মাথায় নিয়েও টি বাভুমা শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যের আফ্রিকান ক্রিকেট পৃথিবীর প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ নেতা হয়েই রয়ে যাবেন। বর্তমান মুল্য না দিলেও, ইতিহাস বাভুমাকে তার যোগ্য মর্যাদা ফিরিয়ে দেবে, যেভাবে তিনি 'চোকার্স' দক্ষিণ আফ্রিকাকে ফিরিয়ে দিলেন চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আশা।

শিল্প, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য আবৃত মল্লিকের রথযাত্রা

অহনা রায়

বাঙালীর উৎসব মুখর নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের একটি টি অন্যতম উৎসব হল আষাঢ় মাসে পালিত রথযাত্রা। যদিও এই রথযাত্রার সূচনা হয় উড়িষ্যায় কিন্তু বর্তমানে তা বাঙালির ১৩ পার্বনের আসনে জায়গা করে নিয়েছে, বাংলার বহু জায়গায় মানুষ আষাঢ় মাসে পালিত এই ৯দিন ব্যাপী উৎসবে মেতে ওঠেন। এমনই এক রথযাত্রা প্রতিবছর আয়োজিত হয় হাওড়া জেলার ঝিখিরা গ্রামের মল্লিক বাড়ির উদ্যোগে, যদি ও এটি পরিচিত মল্লিক বাড়ির রথযাত্রা নামে কিন্তু এটি ঝিখিয়া পার্শ্ববর্তী গ্রাম এবং প্রতিবেশী জেলা হুগলী সহ বিভিন্ন গ্রাম থেকেও বহুমানুষ এই রথযাত্রায় সামীল হন প্রতি বছর, এই রথযাত্রার সূচনা হয় ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে শ্রী হরিনারায়ণ মল্লিকের উদ্যোগে। রথটি বাংলার নবরত্ন শৈলির আদলে কাঠ দিয়ে নির্মিত ও নয়টি চূড়া বিশিষ্ট যার সামনে রয়েছে দুটি কাঠের তৈরি সাদা ঘোড়া ও একজন কাঠের তৈরি সারথী। তবে এই রথের একটি অনন্য বিষয় হল অন্যান্য রথযাত্রার মতো এই রথে জগন্নাথ দেবের মূর্তির বদলে থাকে কাঠের উপর আঁকা জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার চিত্র ও সাথে থাকে মল্লিক বাড়ির আরাধ্য শ্রী দামোদর জীউ এর শালগ্রাম শীলা। তবে এই রথযাত্রার অন্যতম আকর্ষণ হল নয় দিন ব্যাপী বিশাল রথের মেলা ও পুতুল নাচ প্রদর্শনী।

হাওড়া জেলার শ্যামপুর গ্রাম থেকে প্রতিবছর পুতুল নাচের দল নিজেদের কাঠের পুতুল ও সরঞ্জাম নিয়ে আসেন রথযাত্রার এ উৎসবে নিজেদের শিল্প ও কুশলী প্রদর্শন করবার তরে। সুতোর টানে ও বাদ্যযন্ত্রের তালে নাচতে থাকে কাঠের তৈরি রঙিন পুতুল আর তার সাথে বালাশিল্পিদের প্রয়াসে বাঁধা ফোটে পুতুলের মুখে। এভাবেই, সাবিত্রী-সত্যবান, রামায়ণ, বেহুলা-লক্ষীন্দর, ইত্যাদি কাহিনী প্রদর্শিত হয় পুতুল নাচের মঞ্চে, যা বর্তমানে ভূদেব মল্লিক স্মৃতি মঞ্চ নামে পরিচিত। আজও বহু মানুষের সমাগম ঘটে শিল্প ও সংস্কৃতির এই ঐতিহ্যবাহী পুতুল নাচ উপভোগের জন্য।

সব মিলিয়ে এটি জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে ইতিহাস বিজড়িত নয়দিন ব্যাপি এক মিলন উৎসব যা প্রতি বছর কিছু মানুষের ব্যস্ত জীবনে এর মধ্যে কিছুটা আনন্দ ও আশার আস্বাদ দিয়ে যায়।

ঐতিহ্যবাহী মল্লিকের রথ

পুতুলনাচ প্রদর্শনী

Gill's double century, Siraj & Akashdeep's pace attack smash England in 2nd Test

Aditya Adhikari

India defeated England by a huge margin of 336 runs in the second Test at Edgbaston. With this victory, India now draws the five-match series 1-1

Shubman Gill led the entire Indian team as captain for the first time after Rohit Sharma's retirement. He scored a brilliant 269 runs in the first innings and followed it up with another superb 161 runs in the second innings. His classy batting helped India set a massive target of 608 runs for England. He won the Player of the Match award.

Apart from that, Ravindra Jadeja's excellent batting (89 in the first innings and 69 in the second),Yashasvi Jaiswal's courageous opening (87 in the first innings), Rishav Pant and K.L. Rahul's solid contribution helped India make a huge score. India's bowlers also performed very well. Mohammed Siraj bowled with great pace and picked up important wickets in both innings, making it tough for England to build partnerships. Akash Deep supported him well, taking key wickets and keeping the pressure on the English batters.

England were bowled out for 407 runs in their first innings and 271 runs in their second innings while chasing the big target. India's team looked strong and confident throughout the match.

Captain Shubman Gill said after the win, "I'm very proud of the team. Everyone contributed. It's a great feeling to win here."

After losing the 1st Test match against England, the Indian team made an excellent comeback and ensured the victory. Now the fans want to see this victory again in the upcoming test at Lords.

A vibrant Rathyatra in Alipurduar

Debosmita Roy

Netaji Road Durgabari in Alipurduar transforms into a hub of joyous celebration during its annual Rathyatra. This seven-day festival, entirely arranged and managed by ISKCON committee members, is a significant event for the community. Beyond the spiritual rituals, the temple grounds come alive with numerous stalls offering a variety of vegetarian foods, adding to the festive atmosphere and providing a delightful experience for all visitors.

The Rathyatra kicks off with an energetic procession on the first day. Three beautifully decorated chariots, carrying the deities, are pulled through the city streets. Devotees, filled with enthusiasm, dance to the rhythmic beats of "Dhaak er taal" (traditional Bengali drums), creating a captivating spectacle of faith and revelry. Every day of the seven-day festival, arati is performed for the deities, a beautiful ritual of worship and devotion that draws many participants. This vibrant procession, where spiritual devotion meets cultural celebration, captivates onlookers and participants alike. The same joyous atmosphere and energetic procession are replicated on the last day of the Rathyatra, marking a grand finale to the festivities.

Rathyatra at Alipurduar . Picture by Debosmita Roy

For seven days, Netaji Road Durgabari becomes a focal point of devotion, community gathering, and cultural exchange. The meticulous organization by the ISKCON committee ensures a smooth and memorable experience for everyone. This blend of spiritual observance, traditional music, and community engagement, enhanced by the presence of food stalls and daily arati, truly makes the Netaji Road Durgabari Rathyatra a cherished event in Alipurduar.

First-year BSc contributors to *msjChronicle* with their copies of the paper on the university campus .